সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি

জনসংখ্যা একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান শক্তি। একটি দেশের জনসংখ্যা তার আয়তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। তবে এই জনসংখ্যাকে হতে হবে শিক্ষিত ও দক্ষ। জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে যেমন উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, তেমনি অদক্ষ জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

১. বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা করতে পারব;

২. জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;

৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;

৪. বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুহারের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;

৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের আলোকে জনসংখ্যা চাপের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;

৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ-১ : বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটি দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশের দিক এগিয়ে যাচ্ছে। এদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন এবং প্রতিবর্গ কি. মি. এ বসবাস করে ১১১৯জন। ২০১৫-১৬ (সাময়িক) সালে জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ। বর্তমানে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.২২ শতাংশ যা ২০০১ সালে ছিল ১.৫৯ শতাংশ। এবার আমরা বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের তুলনা করব।

বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ	পাঁচ বছর অন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক চিত্র		
	২০০০-০৫	২০০৫-১০	২০১০-২০১৫
বাংলাদেশ	১.৭০	১.১৮	১.২০
ভারত	১.৬৫	১.৪৬	১.২৬
নেপাল	১.৪৪	১.০৫	১.১৮
পাকিস্তান	২.০৭	২.০৭	২.১১
শ্রীলঙ্কা	০.৭৮	০.৬৮	০.৫০
আফগানিস্তান	৪.২৮	২.৭৩	৩.০২
ভুটান	২.৮৭	২.০২	১.৪৬
মালদ্বীপ	১.৬৮	১.৭৩	১.৭৯

উপরের সারণির তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শ্রীলঙ্কা ও নেপালের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভুটান ও মালদ্বীপের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। জনসংখ্যার এ বৃদ্ধির হার নির্ভর করে উক্ত দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার ও অন্যান্য কারণের উপর।

বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনামূলক চিত্র

দেশের নাম	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি. মি.)
মালদ্বীপ	১,৭২৮ জন
সিঙ্গাপুর	৮,২০৭ জন
বাংলাদেশ	১,১১৯ জন
ভারত	৪২৭ জন
শ্রীলঙ্কা	৩৩৮ জন
জাপান	৩৩০ জন

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারত, শ্রীলঙ্কা ও জাপান থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি। অর্থাৎ এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।

কাজ- ১ : পরের পৃষ্ঠার সারণিটি বিশ্লেষণ কর।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার :

আদমশুমারির বছর	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৪	২.৪৮
১৯৮১	২.৩৫
১৯৯১	২.১৭
২০০১	১.৫৯
২০১১	১.৩৭
২০২২	১.২২

পাঠ- ২ : জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা

জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল অবস্থাকে জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা বলা হয়। পরিবর্তনশীলতা জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন প্রধানত জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর ও সামাজিক গতিশীলতার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যার পরিবর্তনের এই বিষয়গুলো বয়স, লিঙ্গ, বিবাহ, সমাজকাঠামো, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। একটি দেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ। কোন বয়সে একটি ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তার উপর স্থূল জন্মহার নির্ভর করে। কোনো দেশে বাল্যবিবাহ বেশি হলে সে দেশের জন্মহার বেশি হবে। জন্মহার কিংবা মৃত্যুহার একটি দেশের জনসংখ্যার কাঠামোকে পরিবর্তন করে থাকে। সুতরাং জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা বলতে বোঝায় জনসংখ্যার কাঠামোর পরিবর্তনকে। জনসংখ্যার এই কাঠামো পরিবর্তনের সাথে কতগুলো বিষয় জড়িত। যেমন- ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমিরূপ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি। যে দেশের জনসংখ্যা যত বেশি শিক্ষিত সে দেশ তত বেশি উন্নত। জ্ঞানের পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষিত লোকের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। ফলে তারা ছোটো পরিবার গঠন করে। পেশাগত পার্থক্যের কারণেও জন্মহারের তারতম্য ঘটে। যেমন-কৃষক, শ্রমিক, জেলে এদের জন্মহার বেশি। ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণির জন্মহার কম।

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলো পাহাড় ও পর্বতে ঘেরা বলে এখানে জনবসতি কম। ফলে এ এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্বও সর্বনিম্ন। চর এলাকাও মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম। অন্যদিকে নদীবিধৌত উর্বর সমতলভূমিতে কৃষির ফলন বেশি হওয়ার কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। তাছাড়া শিল্প কারখানা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে এমন অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে। অনেক সময় কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের হার বেড়ে যায়। আবার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, যুদ্ধাবস্থা, গৃহযুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে স্থানান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ায় জনসংখ্যা কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা দেয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭২.৩ বছর। গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় এটা পরিষ্কার যে আমাদের দেশে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় বৃদ্ধ বয়সী জনসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যাদেরকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই নির্ভরশীল জনসংখ্যা আমাদের দেশে সীমিত

সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক হারে ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণ নারীর অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, ছোটো পরিবার গঠনের পক্ষে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পদক্ষেপ মৃত্যুহার হ্রাসে প্রভাব ফেলছে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে শিশু ও মাতৃমৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এটি জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা রাখছে। তবে জনসংখ্যাকে ভারসাম্য পর্যায়ে রাখতে আমাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো এবং বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন। যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন তাহলো মেয়েদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন জোরদার করা, নারীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

কাজ-১ : তোমার নিজ এলাকার জনসংখ্যা পরিবর্তনশীলতার কারণগুলো চিহ্নিত কর।
কাজ-২ : "বিবাহ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির কারণেই জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির যুক্তিপূর্ণ সমাধান কর।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল

মানুষের একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনকে স্থানান্তর বলে। স্থানান্তরকে অভিগমনও বলা হয়। এ স্থানান্তর অভ্যন্তরে কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছি। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হব

৩.১: অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর

দেশের ভিতরে যখন মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে তখন তাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা হয়। তবে বাজার করা, অফিস করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করাকে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলা যায় না। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর নানাভাবে ঘটে থাকে। আন্তঃআঞ্চলিক স্থানান্তর অর্থাৎ একই অঞ্চলের মধ্যে স্থানান্তর। তাছাড়া গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে এবং শহর থেকে শহরে স্থানান্তর। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই মূলত অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর হয়ে থাকে।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের কারণ

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের জন্য তেমন কোনো আইন বা অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের স্থানান্তর ঘটে আমাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমে কমে যাচ্ছে। অনেকে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ আর্থিক সংকট গ্রামের অনেক মানুষকে শহরে কাজের সন্ধানে আসতে বাধ্য করছে। নদীভাঙন এলাকার মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে শহরে ভীড় করছে। দারিদ্র্য, অভাব অনটন ও অন্যান্য সমস্যার কারণেও গ্রামবাসীর একটি অংশকে শহরের দিকে ধাবিত করছে। গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শহরের উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। গ্রামের সক্ষম ও ধনী কৃষক পরিবার তাদের সন্তানকে

উন্নত শিক্ষার জন্য শহরে পাঠায়। তাছাড়া চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের জন্যও শহরে স্থানান্তর হয়। গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের আরও যেসব কারণ তাহলো শহরে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, বিনিয়োগ ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি। তবে কিছু লোক স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয় এদেশের ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। আমাদের দেশে মানুষের গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের কারণ হলো শিল্প কারখানাগুলো সাধারণত শহরে অবস্থিত। যেমন পোশাক শিল্প ও চামড়াশিল্পের অধিকাংশই শহরে অবস্থিত। এ কারণে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজের জন্য শহরের বস্তি এলাকায় গাদাগাদি করে বসবাস করছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধার জন্যও মানুষ স্থানান্তরিত হয়।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ফলাফল

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের সুফল ও কুফল উভয়ই রয়েছে। বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অংশ রিকশা, গাড়ি, ভ্যানচালক বা শিল্পশ্রমিক হিসেবে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে। তাছাড়া তারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করছে। অন্যদিকে বড়ো কৃষক ও মাঝারি কৃষক পরিবারের সদস্যরা স্থানান্তরিত হয়ে চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য বা নানা ধরনের উৎপাদনমুখী কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে। শহরের স্থানান্তরিত সদস্য তাদের আয় গ্রামে বসবাসকারী সদস্যদের নিকট প্রেরণ করছে। এই অর্থে মাসিক ভরণপোষণের পরে সঞ্চিত অর্থ কৃষি উৎপাদন খাতে এবং অকৃষি খাতে বিনিয়োগ করছে।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের কারণে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়েছে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের। এসব নারীরা কর্মহীন থাকার কারণে পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে বোঝা মনে করতো। ফলে বৈষম্য, বঞ্চনা, প্রতারণা এবং নিপীড়ন তাদের ভাগ্যে জুটত। আজ শুধু পোশাকশিল্পেই বিপুলসংখ্যক নারীশ্রমিক কর্মরত। এখন তাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বেড়েছে। তাদের উপার্জিত অর্থে সন্তানরা লেখাপড়া করছে। উন্নত জীবনযাত্রার কিছুটা হলেও ভোগ করছে।

অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের ফলে আবার স্বল্প আয়ের দরিদ্র মানুষের জন্য বস্তি সৃষ্টি হয়েছে। বস্তি সুস্থ নগরজীবনের জন্য সহায়ক নয়। অপরাধ প্রবণতা, চোরাচালান, অপহরণ, মাদক, নারী ও শিশু পাচারসহ , নানা সামাজিক সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে এই বস্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের কারণে শহরের জনসংখ্যা বাড়ছে। এতে শহরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ও দাম বেড়ে যাচ্ছে। শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরের প্রভাব আমাদের দেশে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য গ্রামে এসে রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি হয়।

গ্রাম থেকে গ্রামে স্থানান্তরের কারণে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ে। একজনের বিপদে একই গ্রামের কিংবা অন্য গ্রামের লোকেরা এগিয়ে আসে। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ে।

শহর থেকে শহরে ও গ্রামে স্থানান্তরের ফলে মানুষের মধ্যে কর্ম দক্ষতা বাড়ে। এতে সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। শহর হতে গ্রাম ও শহরে স্থানান্তর মানুষের আয় ও সঞ্চয়কেও প্রভাবিত করে। কারণ অনেক সময় বিনিয়োগের কারণে জনসংখ্যার স্থানান্তর হয়। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব ফেলে।

৩.২ : আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ

এক স্বাধীন দেশ থেকে অন্য একটি স্বাধীন দেশে চাকুরি, বিয়ে, বসবাস এমনকি নাগরিকতা লাভের জন্য গমন করাকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলে। বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশের মানুষ বিদেশে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। কর্মক্ষেত্রের অভাব, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক আশ্রয়, জলবায়ুর প্রতিকূল পরিবেশ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশের অনেক মানুষ প্রতিবছর স্থানান্তরিত হয়। তাছাড়া অনেকে পারিবারিক নৈকট্য লাভের জন্যও বিদেশে স্থানান্তরিত হয়। আবার কেউ কেউ নাগরিকত্ব লাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ, চাকরি ক্ষেত্রে বদলি ও পদোন্নতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া এবং পেশাজীবী হিসেবে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। উপরের এ কারণগুলো ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের আরও বহু কারণ রয়েছে যা প্রতিদিনের খবরের কাগজে চোখ রাখলেই জানা যায়।

আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ফলাফল

বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের সুফল অনেক। বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা এদেশের কৃষি ও শিল্প, ব্যাংকিং সেবাখাত, গার্মেন্টস শিল্প ও নানা ধরনের লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আবার এ উৎপাদন বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। তাছাড়া চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে আমাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ঘটে।

আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, এইচ আইভি/ এইডসের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসবাহিত রোগ বাইরে থেকে এসে এদেশে বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ফলে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

কাজ-১ : অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করে ছকে উপস্থাপন কর।
কাজ-২ : বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত কর।
কাজ-৩ : 'আন্তর্জাতিক স্থানান্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে'-। কথাটির পক্ষে দলীয়ভাবে যুক্তি দেখাও।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের মা ও শিশুমৃত্যুর পরিস্থিতি

সাধারণভাবে বলা যায় সন্তান প্রসবের পূর্বে, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে শারীরিক কিংবা অন্যান্য কারণে মায়েরা মৃত্যুবরণ করলে তাকে মাতৃমৃত্যু বলা হয়। অন্যদিকে জন্মের পর এক বছর বয়সের

মধ্যে শিশুর মৃত্যু হলে তাকে শিশুমৃত্যু বলা হয়। শিশু মৃত্যুহার হলো প্রতি বছরে জীবিত জন্মগ্রহণকারী প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা।

৪.১ : বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬৫০জন। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ৫৭৪ জন, ২০০১ সালে ৩২২জন এবং ২০১০ সালে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা কমে ১৯৪ জন হয়। বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ১৭৬জন (প্রতি লক্ষে)। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এটা প্রতি লক্ষে ১৫৬জন।

মাতৃমৃত্যুর কারণ

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা অল্পবয়সে গর্ভধারণ করে। গর্ভকালে, অবহেলা, অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রভৃতি কারণে মায়েরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না। ফলে তারা মাতৃত্বকালীন নানা জটিলতায় ভোগে এবং মৃত্যুবরণ করে। তাছাড়া মাতৃমৃত্যুর আরও অনেক কারণ রয়েছে। যেমন- নিম্ন জীবনযাত্রা, বিশুদ্ধ পানির অভাব ও দুর্বল সেনিটেশন ব্যবস্থা, নারী শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত, প্রসবকালীন উচ্চ রক্তচাপ, একলেমশিয়া প্রভৃতি।

মাতৃমৃত্যুর প্রভাব

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর কারণে শিশু প্রয়োজনীয় পুষ্টি হতে বঞ্চিত হয়। ফলে শিশু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুবরণ করে। মাতৃহারা শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে সমস্যা হয়। মাতৃমৃত্যুর কারণে সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প দুধের প্রয়োজন হয়। এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু পেটের পীড়া কিংবা অন্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। দরিদ্র পরিবারের জন্য এই অর্থ খরচ একটি বাড়তি চাপ। অনেক ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যু পারিবারিক বিশৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ। শিশুর প্রতি পিতার অধিকতর যত্নশীল ভূমিকা মাতৃমৃত্যুর প্রভাব লাঘবে সহায়ক হতে পারে।

৪.২ বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর পরিস্থিতি

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ২০০৮ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৯০ সালে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১৪৯জন, ২০০৬ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬৯জনে। ২০০৮ সালে শিশুমৃত্যুর হার আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫২জনে। ২০১৬ সালে শিশুমৃত্যু হার আরো হ্রাস পেয়ে হয় ২৮জন। ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি ১০০০ জীবন্ত জন্মে শিশুমৃত্যু ঘটে ২০জন। সুতরাং বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও উন্নত দেশসমূহের তুলনায় এ হার অনেক বেশি।

শিশুমৃত্যুর কারণ

বাংলাদেশের অনেক মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ফলে মা ও শিশু সঠিক স্বাস্থ্য সেবা, পরিচর্যা পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মূলত দারিদ্র্যের কারণেই শিশুদের একটা অংশ মৃত্যুবরণ করে। তাছাড়া এদেশে এখনও বাল্যবিবাহের প্রচলন রয়েছে। ফলে অল্প বয়সে গর্ভধারণ করায় সন্তান দুর্বল ও পুষ্টিহীন হয়। অনেক সময় শারীরিক জটিলতায় এসব শিশু মৃত্যুবরণ করে। এখনও এদেশে গ্রাম্য প্রশিক্ষণহীন ধাত্রীর হাতে সন্তান প্রসব হয় যা শিশুমৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়। আবার মায়ের অপুষ্টি ও অসুস্থতার কারণে অনেক সময় শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টির কারণে বিভিন্ন রোগ হয়। ফলে অনেক শিশু মৃত্যুবরণ করে।

আমাদের দেশে হাম, পোলিও, যক্ষ্মা, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া ও হুপিং কাশি প্রভৃতি রোগে শিশুমৃত্যুর হার কমলেও এখনও এর প্রভাব কোনো কোনো অঞ্চলে রয়েছে। এর কারণেও শিশুমৃত্যুর হার বাড়ছে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার অভাব, গ্রাম ও শহরের চিকিৎসা সুযোগ সুবিধার তারতম্যের কারণে এদেশে গ্রামীণ এলাকায় শিশুমৃত্যুর হার বেশি। তাছাড়া অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অবহেলার কারণেও শিশু মৃত্যু ঘটে থাকে। এদেশের ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও শিশুরমৃত্যু ঘটে। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল এ ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১,৩৮,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল যার শতকরা ৫০ ভাগই ছিল শিশু।

শিশুমৃত্যুর প্রভাব

পরিবারে শিশুমৃত্যুর ঘটনা খুবই দুঃখজনক। পরিবারে শিশুমৃত্যুর ঘটনার সাথে আমরা কেউ কেউ পরিচিত। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু মারা যায় তখন ঐ পরিবার অনেকটা অগোছালো হয়ে যায়। এই পারিবারিক শোক সামলানো কষ্টকর হয়ে পড়ে।

শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও বাধা সৃষ্টি করে। শিশুর মৃত্যুজনিত কারণে পরিবারের সদস্যরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। যা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির স্বাভাবিক কাজ কর্মে বাঁধার সৃষ্টি করে। ফলে পরিবারটিও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই আমাদের শিশুমৃত্যু বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শিশুমৃত্যু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

কাজ-১ : তোমার এলাকায় মাতৃমৃত্যুর কারণ চিহ্নিত কর।
কাজ-২ : তোমার এলাকায় শিশুমৃত্যুর কারণ চিহ্নিত কর।

পাঠ-৫ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের জন্য মহামূল্যবান। এই সম্পদ একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির মূল উৎস। যে দেশ যত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী সে দেশ তত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী। নিশ্চয়ই তোমরা বিশ্ব মানচিত্র দেখেছ। এ মানচিত্রে কানাডা, রাশিয়া, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র কতো বড় দেশ। তাদের রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ যা জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু বাংলাদশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে বনভূমি, খনিজ কয়লা ও গ্যাস, পাথর, শিলা প্রভৃতি। এই সম্পদের উপর বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। আমরা এ পাঠে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপের প্রভাব সম্পর্কে জানব।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিবারণ করতে হিমশিম খাচ্ছে আমাদের এ দরিদ্র দেশ। এ চাহিদা পূরণে ব্যাপকহারে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। এ কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

বনজ সম্পদের উপর চাপ

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে ব্যাপক হারে কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়ায় বনজ সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বন ধবংস হচ্ছে। এতে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানে দেশ, গ্রাম ও শহরে চলছে বাড়িঘর, রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম। এতে প্রচুর পরিমাণে ইট, কাঠ, পাথর ও লৌহজাত দ্রব্যের প্রয়োজন। ফলে নির্ভর করতে হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। তাই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি জমির উপর চাপ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে কৃষি জমির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে অধিক জনসংখ্যার কারণে চাষযোগ্য জমি ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, শিল্পায়ন ও নগরায়ণজনিত কারণে কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে।

গ্যাস ও জ্বালানি তেলের উপর চাপ

বাংলাদেশে বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী। কাঁচামাল ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানি তেল প্রভৃতি। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হচ্ছে। এদেশে বিদ্যুৎঘাটতি দীর্ঘদিনের সমস্যা। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে প্রয়োজন হয় প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এদেশে এখন ইউরিয়া সার উৎপাদন হচ্ছে। এ সার উৎপাদনে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগের অধিক প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সিএনজিচালিত যানবাহনগুলোতে গ্যাসের ব্যবহার হয়। ফলে গ্যাসের উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে।

পানিসম্পদের উপর চাপ

বাংলাদেশে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পানিসম্পদকে নানাভাবে দূষিত করছে। এতে সুস্বাদু পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। পানিতে বসবাসকারী মৎস্যসম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। তাছাড়া এ পানি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পড়ছে। এজন্য সাগরের পানিও দূষিত হচ্ছে। এতে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।

কাজ-১ :	"বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপই খনিজসম্পদ নিঃশেষের মূল কারণ"- বক্তব্যটি কতটুকু সমর্থন কর?
কাজ-২ :	প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপের প্রভাব চিহ্নিত কর।

পাঠ-৬ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, প্রভাব ও সমাধান পদক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। পৃথিবীর এই ছোটো দেশটিতে জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। এদেশে ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭.৬৪ কোটি, ১৯৯১ সালে ছিল ১১.১৫ কোটি, ২০০১ সালে ছিল ১২ কোটি ৯৩ লাখ, ২০০৭ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৬ লাখ এবং ২০১১ সালে এ সংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। ২০২২ সালে ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯শত ১১জন।২০০১ সালে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৮৩৪জন। ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৭ও ২০২২ সালে জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯০৪, ৯৫৩, ৯৯০, ১০১৫, ১১০৩ ও ১১১৯জনে দাঁড়ায়। তাহলে এখন আমরা বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ জানব।

৬.১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো একক কারণ নেই। অনেক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। বাংলাদেশে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এদেশে স্থূল শিশু মৃত্যুহার উন্নত চিকিৎসা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি প্রভৃতি কারণে হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে জনসংখ্যা বেড়েই চলছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, এদেশে প্রতিবছর জন্ম নিচ্ছে ২৫ লক্ষ শিশু এবং মৃত্যুবরণ করছে সকল বয়সের প্রায় ৬ লক্ষ লোক। ফলে প্রতি বছর ১৯ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো উচ্চ জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার।

এদেশে বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, ধর্মীয় কুসংস্কার এবং আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়মিত ব্যবহার না করা প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া ছেলে সন্তানের প্রত্যাশা, দারিদ্র, নারীশিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এসব কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৎপরতার অভাব, কার্যকর প্রচারণার অভাব প্রভৃতি কারণেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ও বাস্তবায়নের ধীরগতি, কর্মক্ষম নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত না করার কারণেও জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

তোমরা চতুর্থ, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জেনেছ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আগামী তিন দশকে এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা ৪০% এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৬০% এর কাছাকাছি থাকবে। এখন এই কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কর্ম দক্ষ করে গড়া তুলে কাজে লাগালে দেশ খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করবে।

অধিক জনসংখ্যার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপত্তা, বিনোদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অধিক জনসংখ্যা নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে। এই জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত না করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে দেশ পিছিয়ে যাবে।

৬.৩ : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে করণীয়

- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন। তাছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে আইননুগ বয়সের (ছেলেদের ২১ ও মেয়েদের ১৮ বছর) প্রয়োগ কার্যকর করা।
- প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং ছোটো পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।
- জনসম্পদকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা। এই মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, বাসস্থান ব্যবস্থা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দক্ষ মানবসম্পদ শুধু দেশের জন্য নয় বরং বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারবে।

কাজ- ১ : জনসংখ্যা সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পদক্ষেপগুলো লিখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?**

ক. ৪.২০ কোটি খ. ৫.২৮ কোটি

গ. ৫.৫২ কোটি ঘ. ৭.৬৪ কোটি

২. **বাংলাদেশের মৃত্যুহার হ্রাসের কারণগুলো হলো –**

i শিক্ষার হার বৃদ্ধি

ii চিকিৎসা সেবার উন্নতি

iii খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ফৌজিয়া একজন সমাজকর্মী। তিনি নয়নপুর গ্রামে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায় নয়নপুর গ্রামে এক বছরে ৫০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন কারণে পাঁচ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে।

৩. নয়নপুর গ্রামে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী?

ক. উচ্চ জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার খ. জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান

গ. নিম্ন জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার ঘ. উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার

৪. নয়নপুর গ্রামে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে –

i. বাল্যবিবাহ রোধ

ii. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

iii. জনসংখ্যার বহিরাগমন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সারণিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা	
১৯৬১	৫.৫২ কোটি
১৯৭৪	৭.৬৪ কোটি
১৯৯১	১১.১৫ কোটি
২০০১	১২.৯৩ কোটি
২০০৭	১৪.০৬ কোটি
২০১১	১৪.৯৭ কোটি

ক. বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত?

খ. বসতি স্থানান্তর কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে– ব্যাখ্যা কর।

গ. ১৯৬১ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. '১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. **ঘটনা-১**

সফল ব্যবসায়ী হিসেবে চৌধুরী পরিবার ও হালদার পরিবার সিলেটের কুলাউড়া এলাকার অনেকের কাছেই পরিচিত। অথচ চৌধুরীদের আদিনিবাস কিশোরগঞ্জে এবং হালদার পরিবারের মূলবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

ঘটনা-২

সৈয়দপুর, সোহাগীসহ পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের অনেক লোক পরিবারসহ প্রায় ১৫ বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করছেন। তাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এখনও পূর্ব পুরুষদের জন্মস্থান দেখেনি।

ক. স্থূল জন্মহার কাকে বলে?

খ. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১ কোন ধরনের স্থানান্তরকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ঘটনা-২' এ উল্লিখিত স্থানান্তরটি দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের মুখ্য কারণ' বক্তব্যটিকে তুমি কি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।